বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক স্তরবিন্যাস
Social Structure and Social Stratification of Bangladesh

৯

ভূমিকা
Introduction

সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নে সমাজ কাঠামো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। সমাজকে সবিস্তারে জানা এবং বুঝার জন্যেও এর কাঠামো সম্পর্কে ধারণা থাকা অপরিহার্য। সামাজিক কাঠামো হচ্ছে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ, স্থায়ী এবং অনিবার্য উপাদান যা ব্যতীত সমাজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। সমাজের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হচ্ছে সামাজিক স্তরবিন্যাস। সমাজে মানুষের শ্রেণিগত অবস্থান, পেশা ও মর্যাদার স্থায়ী বিভাজন প্রভৃতি বুঝতে হলে সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে ধারণা থাকা অপরিহার্য। সামাজিক স্তরবিন্যাস সামাজিক কাঠামোরও অপরিহার্য উপাদান। বস্তুত কোনো সমাজ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্ট ধারণা পেতে হলে ওই সমাজের কাঠামো এবং স্তরবিন্যাস সম্পর্কে জানার কোনো বিকল্প নেই। সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের দু'টি প্রধান উপকরণ হচ্ছে সমাজের শ্রেণি কাঠামো এবং ক্ষমতা কাঠামো। এর মাধ্যমে সহজেই উপলব্ধি করা যায়, সমাজের কোন কোন উপাদান শ্রেণি বিভাজন এবং ক্ষমতার চর্চাকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশে প্রধানত গ্রামীণ ও নগর সমাজব্যবস্থা বিদ্যমান। ফলে সামাজিক কাঠামো, স্তরবিন্যাস, শ্রেণি কাঠামো এবং ক্ষমতা কাঠামোকেও গ্রামীণ এবং নগর সমাজের প্রেক্ষাপটে বিবেচনায় নিতে হবে। এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে কার্যকর ধারণা অর্জন করা সম্ভব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৯.১ : সামাজিক কাঠামোর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ- ৯.২ : বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো
পাঠ- ৯.৩ : সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাস
পাঠ- ৯.৪ : বাংলাদেশের শ্রেণি কাঠামো
পাঠ- ৯.৫ : বাংলাদেশের ক্ষমতা কাঠামো

মুখ্য শব্দ	সমাজ, সামাজিক কাঠামো, সামাজিক স্তরবিন্যাস, উৎপাদন ব্যবস্থা, পেশা, শিক্ষা, গ্রামীণ সমাজ, নগর সমাজ, শ্রেণি কাঠামো, ক্ষমতা কাঠামো।

পাঠ-৯.১ সামাজিক কাঠামোর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
Definition and Characteristics of Social Structure

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সামাজিক কাঠামো বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- সামাজিক কাঠামোকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন এবং
- সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

সামাজিক কাঠামো কী
What is social structure

আভিধানিক অর্থে কাঠামো (Structure) হচ্ছে নির্মাণ কাঠামো গঠন করা (To construct a framework)। এটি মূলত কোন উপাদান বা বিষয়ের মৌলিক এবং স্থায়ী রূপ। বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইন (Charls Darwin) ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সর্বপ্রথম Structure শব্দটি জীববিজ্ঞানে ব্যবহার করেন। ডারউইন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্পেন্সার সমাজবিজ্ঞানে 'Social structure' প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। Email Durkheim, Radcliffe Brown, T.B Bottomore প্রমুখের আলোচনার মধ্য দিয়ে সামাজিক কাঠামো (Social structure) সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সমাজকে অনুধাবনের জন্য সামাজিক কাঠামোই সর্বাধিক কার্যকরি প্রত্যয়।

সামাজিক কাঠামোর সংজ্ঞা (Definition of social structure)

সামাজিক কাঠামোর সংজ্ঞায়নে অমার্কসীয় এবং মার্কসীয়– এ দু'টি ধারা লক্ষ করা যায়। অমার্কসীয় ধারাকে অনেকে জৈবিক বা বুর্জোয়া ধারা বলেও উল্লেখ করেন। এ ধারার সমাজতাত্ত্বিকেরা সমাজকে জীবদেহের সাথে তুলনা করে থাকেন। জীবদেহ যেমন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি কাঠামোর বিবর্তনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে, তেমনি সমাজদেহও বিবর্তিত হয়। এরও বিভিন্ন উপাদান এবং একটি কাঠামোগত রূপ রয়েছে।

অমার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিকদের অন্যতম Radcliffe Brown (1950) সমাজ কাঠামো সম্পর্কে বলেছেন, সমাজ কাঠামোর উপাদান হচ্ছে মানব সম্প্রদায় এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন সম্পর্ক (The components of social structure are human beings and the types of relationship exists among them.) মানুষের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক, বৈবাহিক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক, পেশাগত সম্পর্কসহ অসংখ্য সামাজিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। ব্রাউন এসব সামাজিক সম্পর্ককেই সমাজ কাঠামো বলে উল্লেখ করেছেন। নৃবিজ্ঞানী Leach-এর মতে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের একগুচ্ছ ধারণা হচ্ছে সমাজ কাঠামো (Social structure consists of a set of ideas about the distribution of power between persons or group of persons.)

Girth and Mills মনে করেন, সমাজ কাঠামোর মূল উপাদান হচ্ছে প্রথা, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং এগুলোর ভূমিকা। Karl Mannheim সমাজের মিথষ্ক্রিয়াকে (Interaction) এবং MacIver & Page সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমন্বয়কে সমাজ কাঠামো বলে উল্লেখ করেছেন।

অমার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে Morris Ginsberg- এর সংজ্ঞাটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। তিনি বলেন, সমাজ কাঠামোর অধ্যয়ন হচ্ছে সামাজিক সংস্থাসমূহের প্রধান প্রধান রূপ; যেমন- বিভিন্ন ধরনের দল, সংঘ ও প্রতিষ্ঠান এবং এগুলোর জটিল রূপ যা সমাজ পরিচালনা করে (The study of social structure is concerned with the principal forms of social organizations i.e. types of groups, association and institutions and the complex of these which constitute society.) সংজ্ঞাটির মূল কথা হচ্ছে, সমাজের প্রধান প্রধান দল এবং প্রতিষ্ঠানের জটিল রূপই সমাজ কাঠামো। বস্তুত প্রধান প্রধান দল এবং প্রতিষ্ঠানই সমাজের মূল উপাদান এবং এগুলোই মূলত সমাজকে পরিচালনা করে।

মার্কসীয় ধারায় সামাজিক কাঠামো হচ্ছে সমাজের মৌল কাঠামো (Basic structure) এবং উপরিকাঠামোর (Super structure) সমন্বিত রূপ। মৌল কাঠামো হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত তথা উৎপাদন ব্যবস্থা। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে সমাজে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক উপাদান ও কর্মকাণ্ডসমূহ যেমন আইন, সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্য ইত্যাদি হচ্ছে ওই সমাজের উপরিকাঠামো। কার্ল মার্কসের মতে, উৎপাদন ব্যবস্থার মূলে রয়েছে উৎপাদন সম্পর্ক (Relations of production) এবং উৎপাদন শক্তি (Forces of production)। এর মাধ্যমেই গোটা সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিনির্মিত হয়। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই (Basic structure) সংশ্লিষ্ট সমাজের কাঠামো নির্ধারণ করে। মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী সমাজের উপরি কাঠামো নির্ধারণেও মৌল কাঠামোর প্রভাব রয়েছে।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী T. B. Bottomore তাঁর *'Sociology'* গ্রন্থে সমাজ কাঠামো বিষয়ে মার্কসীয় এবং অমার্ক্সীয় উভয় ধারার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি সমাজ গঠনের পাঁচটি পূর্বশর্তের উল্লেখ করেছেন যার মাধ্যমে সমাজ কাঠামোর উপাদানসমূহকে সহজে চিহ্নিত করা যায়। এগুলো হচ্ছে:

১। **যোগাযোগ ব্যবস্থা** (A system of communication): সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ তথা ভাবের আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিভিন্ন ভাষা ও ভাষাকেন্দ্রিক দল, সাহিত্য, সংস্কৃতি, গণমাধ্যম ইত্যাদি।

২। **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা** (An economical system): সমাজের সম্পত্তি, মালিকানা ও বণ্টন ব্যবস্থা; উৎপাদন, বিতরণ, বাজারজাতকরণ, মূল্য ব্যবস্থাপনা; উৎপাদন ও সম্পদে মালিকানার ভিত্তিতে সমাজে বিদ্যমান শ্রেণি ব্যবস্থা সবকিছু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত। সমাজের মূল নিয়ন্ত্রক হচ্ছে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এটিকে কেন্দ্র করেই সমাজে বিভিন্ন দল, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী, সামাজিক স্তরবিন্যাস ইত্যাদি গড়ে ওঠে।

৩। **পরিবার ও শিক্ষাসহ সামাজিকীকরণের সব ব্যবস্থা** (Whole system of socialization including family and education): পরিবার, জ্ঞাতিত্ব, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংঘ, সমিতিসহ যাবতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও দল এখানে অন্তর্ভুক্ত। এগুলো ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব টিকে থাকা সম্ভব নয়। এ সব প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করেই মানুষ সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং সমাজকে টিকিয়ে রাখে।

৪। **কর্তৃত্ব ব্যবস্থা এবং ক্ষমতার বণ্টন** (A system of authority and the distribution of power): সমাজে মানুষের নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য। কর্তৃত্বের স্বরূপ নির্ধারণ এবং ক্ষমতার বণ্টন সামাজিক ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সেদিক থেকে রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্র, সরকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, নির্বাচন, নির্বাচকমণ্ডলী ইত্যাদি সমাজ কাঠামোর মৌলিক উপাদান।

৫। **যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান** (A system of ritual): ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিসহ সমাজের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা, রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি সমাজ গঠনে যেমন ভূমিকা রাখে, তেমনি সামাজিক কাঠামোর উপাদান হিসেবেও এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। জন্মোৎসব, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, এ সম্পর্কিত নানা প্রথা ও রীতিনীতি, ধর্মীয় উৎসব, বর্ষবরণসহ নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেকোনো সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই এগুলো সমাজ কাঠামোরও অন্তর্গত।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক কাঠামো হচ্ছে সমাজের মৌলিক ও স্থায়ী রূপ। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের প্রধান প্রধান দল, শ্রেণি বা মানবগোষ্ঠীর সমন্বয়েই গঠিত হয় সামাজিক কাঠামো। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দলের নানাবিধ কর্মকাণ্ড, ভূমিকা, আচার-আচরণ, বিধি-ব্যবস্থা, প্রথা-বিশ্বাস সামাজিক কাঠামোকে সজীব, সক্রিয় এবং গতিশীল রাখে।

সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of social structure)

সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হিসেবে সামাজিক কাঠামোর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন:

১। **প্রতিটি সমাজেরই একটি কাঠামোগত দিক রয়েছে:** আদিম সমাজ ছিল সরল ও সাম্যবাদী। সেখানে কাঠামোগত বিষয়টি তেমন প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু সম্পদে ব্যক্তিগত মালিকানা নির্ভর এবং উৎপাদনভিত্তিক প্রতিটি সমাজেরই কাঠামো রয়েছে। কৃষিভিত্তিক কিংবা শিল্প সমাজ, গ্রামীণ কিংবা নগর সমাজ; দাস, সামন্ত কিংবা পুঁজিবাদী সমাজ; ভারতীয়, এশীয়, ইউরোপীয় কিংবা মার্কিন সব সমাজই নির্দিষ্ট কাঠামোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং পরিচালিত হয়।

২। **বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে সমাজের কাঠামো নির্মিত হয়:** সমাজ কাঠামোর কিছু অপরিহার্য উপাদান রয়েছে। এসব উপাদান সমাজের কাঠামো নির্মাণ করে। যেমন– সমাজে বিদ্যমান অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদন সম্পর্ক, সম্পদের মালিকানা, ক্ষমতা, শ্রেণি ও সামাজিক স্তরবিন্যাস, সামাজিক সম্পর্ক, প্রথা, রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি সামাজিক কাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এসব উপাদান একটি সমাজকে মৌলিক, দৃশ্যমান এবং স্থায়ী রূপ দান করে। এ কারণেই এগুলো সমাজ কাঠামোর উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

৩। **সামাজিক কাঠামোর মধ্য দিয়েই সমাজ দৃশ্যমান হয়:** সমাজ একটি বিমূর্ত প্রত্যয়। ফলে সমাজকে সরাসরি দেখা যায় না। সামাজিক কাঠামো এবং এর বিভিন্ন উপাদানের মধ্য দিয়ে সমাজ দৃশ্যমান হয়। যেমন কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে ওই সমাজকে কৃষিভিত্তিক সমাজ বলা হয়। আবার ব্যক্তিগত মালিকানা, পুঁজির অবাধ প্রবাহ, মুনাফা লাভের সুযোগ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা দ্বারা পুঁজিবাদী সমাজকে চিহ্নিত করা যায়। একইভাবে নানা উপাদানের ভিত্তিতেই গ্রামীণ, নগর কিংবা শিল্প সমাজ দৃশ্যমান হয়। অর্থাৎ যেসব উপাদানের মধ্য দিয়ে সমাজ দৃশ্যমান হয়, কিংবা একটি সমাজকে চিহ্নিত করা যায় তা হচ্ছে মূলত সামাজিক কাঠামোর উপাদান। সুতরাং কোনো সমাজকে প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে এর কাঠামো এবং এর বিভিন্ন উপাদানকে বিবেচনায় নিতে হবে।

৪। **সামাজিক কাঠামো ধীরে পরিবর্তিত হয়:** আমরা জানি, সমাজ পরিবর্তনশীল। সমাজ কাঠামোও পরিবর্তনশীল। তবে সমাজের বহিরাঙ্গ যত দ্রুত পরিবর্তিত হয় সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তন তত দ্রুত হয় না। সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা, ক্ষমতা কাঠামো, শ্রেণি কাঠামো, প্রথা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পরিবর্তন হয় খুব ধীরে। কারণ, এগুলো সামাজিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রক উপাদান। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোয় কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, বিবাহ, পরিবার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গত একশত বছরে দেশে দৃশ্যমান সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। কৃষি অর্থনীতির পাশাপাশি শিল্প ও সেবাভিত্তিক অর্থনীতি বিকশিত হয়েছে, রক্ষণশীলতার পরিবর্তে ছেলে-মেয়েদের নিজস্ব পছন্দে বিয়ে এবং যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তবে বৈশিষ্ট্যগত কিছু পরিবর্তন সাধিত হলেও সামাজিক কাঠামোর উপাদান হিসেবে কৃষি অর্থনীতি, বিবাহ এবং পরিবার ব্যবস্থা এখনো অপরিহার্য ও অনিবার্য। সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার মৌলিক বা বৈপ্লবিক পরিবর্তনে সামাজিক কাঠামোরও আমূল পরিবর্তন ঘটে। যেমন- দাস সমাজ থেকে সামন্ত সমাজ, সামন্ত সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজে উত্তরণ; বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চীন, রাশিয়া এবং কিউবার সমাজব্যবস্থায় সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। দ্রুতগতিতে ব্যাপক নগরায়ণ, শিল্পায়ন, আধুনিকায়ন, সেবাখাত ও তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের মধ্য দিয়েও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন হয়ে থাকে।

৫। **সমাজ কাঠামো অর্থনীতি বা উৎপাদন ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত:** সমাজের মূল নিয়ন্ত্রক বা চালিকাশক্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদনের উপকরণ, উৎপাদন সম্পর্ক, পুঁজি বা সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা, ভোগ ও বন্টন ব্যবস্থা, বাজার ব্যবস্থা ও মুনাফার সামগ্রিক রূপ। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঘিরে আরো নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী ও সংগঠনের রয়েছে বহুবিধ কার্যক্রম এবং ভূমিকা। এর মাধ্যমেই সামাজিক কাঠামোর স্বরূপ নির্ধারিত হয়। যেমন দাস, সামন্ত কিংবা কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামাজিক কাঠামোও এগুলোর উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আবার পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক বা শিল্প অর্থনীতির সমাজ কাঠামো ওই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আদলে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয় যেমন কৃষি অর্থনীতির দৃশ্যমান প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তেমনি নগর সমাজের কাঠামোয় দেখা যায় শিল্প অর্থনীতির প্রভাব। সুতরাং সমাজের কাঠামোগত বিষয়টি এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত ও প্রভাবিত।

৬। **প্রতিটি সমাজের কাঠামোই স্বতন্ত্র:** একটি সমাজ অন্য সমাজ থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র। একইভাবে প্রতিটি সমাজের কাঠামোও পৃথক। সমাজের বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় ওই সমাজের কাঠামো দ্বারা। আর সমাজ কাঠামোর প্রকৃতি নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট সমাজের অর্থনীতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। ফলে কৃষি সমাজের কাঠামো থেকে শিল্প সমাজের কাঠামো যেমন আলাদা, তেমনি পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামো অপেক্ষা সমাজতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

৭। **সামাজিক কাঠামোই সমাজের পরিচয় নির্ধারণ করেঃ** সামাজিক কাঠামো কেবল সমাজকে দৃশ্যমান করে না, সমাজের পরিচয়ও নির্ধারণ করে দেয়। আমরা একটি সমাজকে কীভাবে চিহ্নিত করবো তা ওই সমাজের কাঠামো দ্বারা নির্ধারিত হয়। দাস সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজ, গ্রামীণ কিংবা নগর সমাজ, কৃষিভিত্তিক সমাজ নাকি শিল্প সমাজ, সনাতন কিংবা আধুনিক সমাজ যা-ই বলা হোক না কেন এটি নির্ধারিত হয় ওই সমাজের সামাজিক কাঠামো দ্বারা। সামাজিক কাঠামোর যে পরিচয় ও আদল, সমাজেরও অনুরূপ পরিচয় প্রকাশ পায়। আর সে কারণেই অনেক সময় সমাজ সম্পর্কিত আলোচনার সাথে সামাজিক কাঠামোর আলোচনা একাকার হয়ে যায়।

সারসংক্ষেপ

যেকোনো সমাজব্যবস্থাকে জানার জন্য সামাজিক কাঠামোর অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক কাঠামো হচ্ছে ওই সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থাসহ প্রধান প্রধান দল বা গোষ্ঠী, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, সংস্কৃতি তথা মৌলিক উপদানের সমষ্টি। এটি সমাজের মোটামুটি স্থায়ী বিষয়। নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে সামাজিক কাঠামো ওই সমাজের মূল চরিত্রকে তুলে ধরে।

পাঠ-৯.২ বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো
Social Structure of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের পরিবর্তিত সমাজ কাঠামো ব্যখ্যা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ কাঠামো চিহ্নিত করতে পারবেন।

বাংলাদেশের পরিবর্তিত সমাজ কাঠামো
Changing social structure of Bangladesh

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা বুঝতে হলে এর সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ প্রাচীন বঙ্গ জনপদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতিফলন। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে এ ভূখণ্ডের রয়েছে সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। প্রাচীন কাল থেকেই এখানে সভ্যতার স্ফূরণ ঘটেছিল। বিবর্তন, বিকাশ, পরিবর্তন ও উত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজব্যবস্থা বর্তমান রূপ লাভ করেছে। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলার সমাজ কাঠামো গ্রামীণ এবং কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় সমৃদ্ধ। প্রাচীন কাল থেকে ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত গ্রামীণ সমাজ কাঠামো নিশ্চল, অপরিবর্তিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ কর্মকর্তা C. Metcalfe (1830) কে উদ্ধৃত করে বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানের জনক A.K Nazmul Karim (1996) লিখেছেন, "The village communities are little republics, having nearly everything they want within themselves, and almost independent of any foreign relations. ... Dynasty after dynasty tumbles down; revolution succeeds revolution; Hindu, Pathan, Mughal, Mahratta, Sheikh, English are masters in tern; but the village communities remain the same."

চার্লস মেটক্যাফ মূলত উত্তর ভারতের গ্রামীণ সমাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে উপর্যুক্ত মন্তব্য করেছিলেন। তবে ভারতের অন্যান্য অংশ সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্মকর্তা Elphinstone, Denzil Ibbetson প্রমুখ প্রায় অভিন্ন মন্তব্য করেছেন। সুতরাং তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ হিসেবে বাংলার সমাজ কাঠামোও অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির কারণে এখানে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এখনো আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে কৃষকই জমির মালিক ছিলেন (মুনতাসির মামুন, ১৯৭৫)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেবল ভূমিব্যবস্থায় নয়, সমাজ কাঠামো এবং সমাজব্যবস্থায়ও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। লর্ড কর্নওয়ালিসের মতে, 'এখন থেকে সামন্ত জমিদার, চৌধুরী, তালুকদারগণ জমির মালিক বলে বিবেচিত হবেন' (পূর্বোক্ত)। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ও রায়তের মাঝখানে একাধিক মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি তৈরি হয়েছিল। কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার এই শ্রেণি কাঠামোতে জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী এবং রায়ত-কৃষকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মুসলিম সমাজের বংশগৌরব এবং হিন্দু সমাজের বর্ণপ্রথাও সামাজিক মর্যাদার গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচিত হতো।

বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে নানা ঘটনা ও উপাদান বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোকে প্রভাবিত করে। বাঙালির ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, কলকাতাকেন্দ্রিক অবস্থানের প্রবণতা, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পাটশিল্পের বিকাশ এবং পাটের উচ্চমূল্য বাংলায় একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশে ভূমিকা রাখে। ব্রিটিশবিরোধী তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী শক্তিতে বলীয়ান মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ঘটে। প্রজাস্বত্ব আইনের (১৯৫০) মাধ্যমে জমিদারি প্রথা বিলোপের ফলে গ্রামীণ সমাজে নতুন শ্রেণি ও ক্ষমতা কাঠামো তৈরি হয়। জমিদারের জায়গায় পূর্বের মধ্যস্বত্বভোগীরা বড় কৃষক ও মহাজন হিসেবে আবির্ভূত হন। ভূমিমালিক ছাড়াও রাষ্ট্র, রাজনীতি, সরকারের সাথে সম্পর্কিত

ব্যক্তি সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। বাংলার চিরায়ত সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে এসময় থেকেই শিক্ষিত পেশাজীবী শ্রেণি, নগর সমাজ, শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা এবং শিল্প-শ্রমিক শ্রেণির বিকাশ হতে থাকে।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশে সামাজিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। সরকার অধিকাংশ শিল্প-কল-কারখানা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করে। কৃষি জমি উচ্চসীমা (সিলিং) নির্ধারণ করে দেয় এবং সমাজের বৈষম্য নিরসনেও বহুবিধ উদ্যোগ গৃহীত হয়। কৃষি আধুনিকীকরণের পাশাপাশি শিক্ষা এবং শিল্পোৎপাদনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ফলে সমাজের শ্রেণি কাঠামো এবং ক্ষমতা কাঠামোতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোতেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ কাঠামো (Present social structure of Bangladesh)

এখানে বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ কাঠামো এবং এর মূল উপাদান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১। **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা:** সামাজিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ওই সমাজের অর্থনেতিক ব্যবস্থা। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় বর্তমানে মিশ্র অর্থনীতি প্রচলিত। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় (জিডিপি) কৃষির ১৩.৬০ শতাংশ, শিল্পের ৩৫.১৪ শতাংশ এবং সেবাখাতের ৫১.২৬ শতাংশ অবদান চিহ্নিত হয়েছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯)। মোট শ্রমজীবীর ৪০.৬০ শতাংশ কৃষিতে, ২০.৪০ শতাংশ শিল্পোৎপাদনে এবং ৩৯.০০ শতাংশ সেবাখাতে নিয়োজিত। তবে কৃষি এদেশের অর্থনীতির প্রাণ। সে কারণে কৃষি আধুনিকীকরণ এবং কৃষি উৎপাদনে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। আবার উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে এখানে শিল্পোৎপাদনের পাশাপাশি সেবা খাতও সমানভাবে বিকশিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত পুঁজিবাদভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় শোষণ ও বৈষম্য বিদ্যমান। সমাজে পুঁজিপতি, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বিত্তশালীদের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

২। **বিবাহ ও পরিবার কাঠামো:** বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোয় বিবাহ এবং পরিবার দু'টি অপরিহার্য প্রত্যয়। বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্ক কিংবা একত্রে বসবাস (Living together) এখনো এ সমাজে নিষিদ্ধ। প্রাচীন কাল থেকে বাংলার সমাজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে বিবাহ এবং পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে সময়ের বিবর্তনে ছেলেমেয়ের নিজস্ব পছন্দে (রোমান্টিক) বিয়ের প্রবণতা এবং একক পরিবার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজও এ পরিবর্তনকে অনেকটা সহজভাবে গ্রহণ করছে। কিন্তু সমাজ থেকে বিয়ে এবং পরিবারের গুরুত্ব এতটুকু হ্রাস পায়নি।

৩। **জনসংখ্যা ও নৃগোষ্ঠী:** বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ। দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ৩৭ লক্ষ এবং এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে প্রায় ১১০৩ জন মানুষের বসবাস (বিবিএস ২০১৮)। জনসংখ্যার প্রায় ৯৮ শতাংশ বাঙালি, বাকি দুই শতাংশ বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে বাঙালি সংকর জনগোষ্ঠী। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা, গারো, সাঁওতাল, মারমা, ত্রিপুরা, কুকি, মনিপুরী, রাখাইন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪। **রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা:** বাংলাদেশের মানুষ রাজনীতি-সচেতন এবং এখানে রাজনৈতিক দলের প্রভাবও সর্বজনবিদিত। রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনার পূর্বশর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ম্যান্ডেট আদায় করা। স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় সামরিক শাসনের উত্থান ঘটেছে, কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে তা জনগণের সমর্থন ও স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হয়েছে। গত প্রায় তিন দশক যাবৎ দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত। এসময় দেশের রাজনীতি প্রধানত দু'টি ধারায় মেরুকরণ হয়েছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা (প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভা এবং সংসদ সদস্যগণ) এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত। স্থানীয় সরকারের তৃণমূলে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য প্রত্যেকে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি হিসেবে সামাজিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায়

নেই। সামরিক ও বেসামরিক আমলাসহ যেকোনো সরকারি কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিচারিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গ্রামীণ কিংবা নগর সমাজের সামাজিক কাঠামোয় বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেন।

৫। **শিক্ষা ও পেশা:** দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষার হার এর দিক থেকে বাংলাদেশ অনগ্রসর ছিল। একবিংশ শতকের প্রথম দশকেও বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ছিল ৫০ শতাংশের কাছাকাছি। বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার প্রায় ৭০ শতাংশ। নারীরা একসময় শিক্ষায় পিছিয়ে থাকলেও এখন অনেকটাই অগ্রগতি হয়েছে। দেশের প্রাথমিক স্তরের প্রায় শতভাগ ছেলেমেয়েই স্কুলে যায় এবং এখানে ছেলে-মেয়ের অনুপাত প্রায় সমান। মাধ্যমিক স্তরে ছেলেমেয়েদের ঝরে পড়ার হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। তবে আর্থ-সামাজিক কারণে উচ্চ শিক্ষায় বাংলাদেশে নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে।

পেশাগত দিক থেকে বাংলাদেশে কৃষিবহির্ভূত খাত ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা কৃষি কাজে সম্পৃক্ত হতে তেমন আগ্রহী নয়। পেশা যা-ই হোক না কেন, মানুষের মধ্যে গ্রাম অপেক্ষা নগর জীবন আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। সবার মধ্যেই শহরমুখি হওয়ার প্রবণতা। নগর সমাজকে কেন্দ্র করে দেশে শিল্প, সেবাখাতে কাজের সুযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, নতুন নতুন নানা উদ্যোগ (অনলাইন ও এ্যাপসভিত্তিক মার্কেটপ্লেস) এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে পেশার নানা দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। সনাতন কৃষির পরিবর্তে ডেইরি, পোল্ট্রি, মৎস্য, সবজি ও ফল চাষ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। মোটাদাগে বাংলাদেশের পেশাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন:

ক) **কায়িক পরিশ্রম নির্ভর পেশা:** কৃষি মজুর, শিল্প-কারখানার শ্রমিক, পরিবহন কিংবা নির্মাণ শ্রমিক, দিনমজুর, ভ্যান ও রিকশা চালক, হকার প্রমুখ।

খ) **মানসিক শ্রমনির্ভর পেশা:** এটিকে অনেকে 'হোয়াইট-কালার জব' হিসেবে উল্লেখ করেন। শারীরিক পরিশ্রম না থাকলেও এখানে মানসিক পরিশ্রম হয়। অফিসের কেরানি থেকে শুরু করে শীর্ষ কর্মকর্তা প্রায় সবাই এ ধরনের পেশার অধিকারী। সরকারি, বেসরকারি চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বত্রই মানসিক শ্রমনির্ভর পেশা (হোয়াইট-কালার জব) প্রচলিত।

গ) **কারিগরি পেশা:** প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ফলে কারিগরি পেশার বিস্তার ঘটে। বর্তমানের বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি, ইলেক্ট্রনিক, পরিবহন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন খাতে কারিগরি পেশার সম্প্রসারণ ঘটছে।

ঘ) **বুদ্ধিবৃত্তিক পেশা:** শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক, আমলা, সাংবাদিক প্রমুখ বুদ্ধিবৃত্তিক পেশায় নিয়োজিত।

৬। **ভাষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা:** বাংলাদেশের প্রধান ভাষা বাংলা। বেশকিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা রয়েছে। ব্যবহারের দিক থেকে সর্বত্র বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয় প্রমিত বাংলা ছাড়াও আঞ্চলিক ভাষার আধিক্য রয়েছে। উচ্চ শিক্ষিত ও ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষিত অনেকে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেন। ধর্মীয় কারণে বাংলাদেশে আরবি বহুল পরিচিত ভাষা। অধিকাংশ মুসলমান আরবি পড়তে পারলেও আভিধানিক অর্থ ও ব্যাকরণ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। আকাশ সংস্কৃতির কারণে তরুণ প্রজন্মের অনেকের মধ্যে হিন্দি ভাষার প্রভাব লক্ষ করা যায়। অনেকেই হিন্দি বুঝতে ও বলতে পারেন। ভাষার মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের ক্ষেত্রে এখন তথ্য প্রযুক্তির বহুবিধ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ই-মেইল, ইন্টারনেটভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের এ্যাপস মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অনেক সহজ করে দিয়েছে।

৭। **শ্রেণি ও সামাজিক স্তরবিন্যাস:** বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা শ্রেণিভিত্তিক ও বৈষম্যমূলক। এখানে বিত্তহীন, দরিদ্র বা নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ রয়েছে। শ্রেণি বিভাজনের মূলে রয়েছে সম্পদের মালিকানা। সমাজের অনেকে নিঃস্ব, নিজস্ব শ্রমশক্তিই তাদের একমাত্র সম্পদ! সমাজের একটি বড় অংশ অল্প সম্পদের মালিক। আর অল্পকিছু মানুষ বিপুল সম্পদের অধিকারী। সম্পদ ছাড়াও শিক্ষা, বংশমর্যাদা, পেশা, ক্ষমতা প্রভৃতি সূচকের ভিত্তিতে সমাজের মানুষের মধ্যে শ্রেণি বিভাজন, অসমতা ও স্তরবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়।

৮। **ধর্মবিশ্বাস ও উৎসব:** বাংলাদেশের মানুষ ধর্ম পরায়ণ। এদেশের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান। প্রায় ৮ শতাংশ সনাতন (হিন্দু) ধর্মের অনুসারী। বাকিরা বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। সব ধর্মের মানুষই নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ ধর্মের চর্চা করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, বড়দিন, বুদ্ধপূর্ণিমা এদেশের বড় ধর্মীয় উৎসব। ধর্মীয় উৎসবগুলোতে অন্যান্য ধর্মের মানুষও সানন্দে

অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একে অপরের প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন। ধর্মীয় উৎসব ব্যতীত বেশকিছু জাতীয় উৎসব বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন পহেলা বৈশাখের বাংলা নববর্ষ উৎসব। শত শত বছর ধরে চলে আসা এ উৎসব আবহমান বাংলার কৃষি অর্থনীতি, জীবন ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। স্বাধীনতা দিবস, শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বিজয় দিবস আমাদের জাতীয়তাবাদ, জাতীয় ঐক্য ও বিজয়ের গৌরবগাথার স্মারক।

৯। **প্রথা ও সামাজিক মূল্যবোধ:** বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোয় প্রথা এবং মূল্যবোধের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আবহমানকাল থেকে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি সুনির্দিষ্ট কিছু প্রথা ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত। পিতা-মাতা ও মুরুব্বিদের সম্মান করা, পিতা-মাতার বয়স হলে তাদের ভরণপোষণ প্রদান ও দেখাশোনা করা, পরিবার ও আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে কেউ অসহায় থাকলে তাদের সহায়তা করা আমাদের প্রথা ও মূল্যবোধের অপরিহার্য অংশ। তবে নারীর প্রতি কুরুচিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্ক, প্রকাশ্যে মদ্যপান এবং নেশা করা, চলাফেরা ও পোশাক-পরিচ্ছদে উগ্রতা আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থি।

১০। **পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভ্যাস:** বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় শালীন পোশাক পরিধানের রীতি রয়েছে। পুরুষেরা লুঙ্গি-পাঞ্জাবি, শার্ট-প্যান্ট, জিন্স-টিশার্ট-ফতুয়া-গেঞ্জি ইত্যাদি পরিধান করেন। অধিকাংশ বাঙালি নারী শাড়ি পরেন। শাড়ি ছাড়াও এদেশের নারীদের মধ্যে সালোয়ার-কামিজ-ওড়না (থ্রি-পিস) অনেক জনপ্রিয়। নারীদের মধ্যে কেউ কেউ হিজাব এবং বোরকা পরিধান করেন। আবার শহরের অনেক আধুনিক নারী জিন্স-ফতুয়া-টিশার্ট পরিধান করছেন।

খাদ্যাভ্যাসের দিক থেকে বলা যায় 'মাছে-ভাতে বাঙালি'। সমাজে নানা পরিবর্তন, খাদ্য তালিকায় নতুন নতুন সংযোজন হলেও বাঙালির কাছে মাছ-ভাতই প্রথম চাহিদা। ভাতের পাশাপাশি রুটি-পরটা এবং খিচুড়িও অনেক জনপ্রিয়। মশলাযুক্ত তরকারি বাঙালির রন্ধন-সংস্কৃতির ঐতিহ্য। পিঠা-পুলি-পায়েস আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। শীতকালে গ্রামীণ জনপদে নানা ধরনের পিঠা তৈরি হয়। সাম্প্রতিককালে শহরে আয়োজিত পিঠা উৎসব, নবান্ন উৎসব নগর সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করছে। তবে বিয়েসহ বিভিন্ন উৎসবে পিঠার উপস্থিতি কমে গেছে। এখানে পোলাও-রোস্ট, বিরিয়ানি, নানাপদের মাংস, জর্দা, বুরহানি ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। তরুণদের মধ্যে ফাস্ট-ফুড, 'বার্বিকির্উ' বেশ জনপ্রিয়। তবে দেশের কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ তাদের পরিবার-পরিজনের জন্য মোটা চালের ভাতের যোগান দিতেই অনেকসময় হিমশিম খান। তাদের খাবারে পর্যাপ্ততা না থাকায় বৈচিত্র্যও অনেক কম। মাছ-ভাত, ডাল-রুটির নিশ্চয়তা পেলেই তারা খুশি।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক কাঠামো অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থাকে সঠিকভাবে জানা যায়। বর্তমান সমাজব্যবস্থা মূলত দীর্ঘদিনের ক্রমপরিবর্তনের ফল। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোকে জানতে হলে এর অতীতের দিকে নজর দিতে হবে। একইসাথে বর্তমানে যেসব উপাদানের মধ্য দিয়ে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন দৃশ্যমান হয় সেবিষয়ে পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিভঙ্গি থাকা বাঞ্ছনীয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ কাঠামোর নানা উপাদান চিহ্নিত করা সম্ভব।

পাঠ-৯.৩ সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাস
Social Inequality and Stratification

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সামাজিক অসমতার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরনসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সামাজিক অসমতা
Social inequality

সামাজিক অসমতার অর্থ হচ্ছে যেকোনো সমাজে মর্যাদা, ক্ষমতা, সম্পদ ইত্যাদির অসমবন্টন। সমাজের নানাবিধ উপাদানের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে যে বিভক্তি বা শ্রেণি বিভাজন সৃষ্টি হয় তাই সামাজিক অসমতা। অর্থাৎ সামাজিক অসমতা বলতে বুঝায় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য বা অসাম্য। প্রতিটি সমাজেই কোনো না কোনো উপাদানের ভিত্তিতে অসমতা পরিলক্ষিত হয়। সেদিক থেকে সামাজিক অসমতা হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত বিষয়বস্তুতে অসম অধিকার। অর্থাৎ সমাজের সুনির্দিষ্ট, স্থায়ী, গুণগত এবং তাৎপর্যপূর্ণ উপাদানের ভিত্তিতে যে শ্রেণি বিভাজন হয় তাকে সামাজিক অসমতা বলে। সম্পত্তি, শিক্ষা, পেশা, বংশমর্যাদা ইত্যাদি সামাজিক অসমতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

সামাজিক অসমতার সংজ্ঞায় J. Matras (1975) বলেছেন, সামাজিক অসমতা সামাজিক পুরস্কার বা প্রতিদান, সম্পদ ও সুবিধা, সম্মান ও শ্রদ্ধা, অধিকার ও পদমর্যাদা এবং ক্ষমতা ও প্রভাবের অসম বণ্টন যা সামাজিক অবস্থার পার্থক্যের সাথে সম্পর্কিত (Social inequality is that inequality in the distribution of social rewards, resources and benefit, honour and esteem, rights and privileges and power and influence which is associated with the difference in social position.)

H. R. Kerbo (1983)- এর মতে, সামাজিক অসমতা হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যার মাধ্যমে জনগণ সমাজের মূল্যবান সম্পদ, সেবা ও পদমর্যাদায় সমান অধিকার বা অভিগম্যতা থেকে বঞ্চিত হয় (Social inequality is the condition whereby people have unequal access to valued resources, services and positions in the society.) উল্লেখ্য, সামাজিক অসমতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে লিঙ্গ (নারী-পুরুষ), বয়স, বংশমর্যাদা, জাতিবর্ণ, সম্পদ, শিক্ষা, পেশা, ক্ষমতা ইত্যাদি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সুতরাং সামাজিক অসমতা হচ্ছে সমাজ বিভাজনের একটি প্রক্রিয়া যা সমাজের মূল্যবান উপাদানসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে নারী-পুরুষ, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ, ধনী-দরিদ্র, শ্রমিক-মালিক, শিক্ষিত-নিরক্ষর, পেশাজীবী-শ্রমজীবী প্রভৃতি শ্রেণি বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। সমাজে মানুষের এই বিভাজনই সামাজিক অসমতা তৈরি করে।

সামাজিক স্তরবিন্যাস (Social stratification)

স্তরবিন্যাস (Stratification) শব্দটি মৃত্তিকা বিজ্ঞান থেকে এসেছে। ভূ-গঠনে মাটির বিভিন্ন স্তরের ন্যায় সমাজের মানুষও বিভিন্ন শ্রেণি ও স্তরে বিভক্ত। নানা উপাদানের ভিত্তিতে সমাজের মানুষের মধ্যে যে উঁচু-নীচু বিন্যাস পরিলক্ষিত হয় সাধারণ অর্থে তাকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাসকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন Gisbert তাঁর *Fundamentals of Sociology* গ্রন্থে বলেছেন, সমাজকে একটি স্থায়ী দল বা প্রকরণে বিভক্ত করাই হচ্ছে সামাজিক স্তরবিন্যাস যেখানে একে অন্যের সাথে মানের উচ্চক্রম এবং নিম্নক্রমের ভিত্তিতে সম্পর্কিত (Social

stratification is the division of society in permanent groups or categories linked with each other by the relationship of superordination and subordination.)

Davis and Moore মনে করেন, সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে সমাজের মানুষের মধ্যে বিভক্তি। এর মূলে রয়েছে মানুষের বিভিন্ন কর্মপ্রক্রিয়া। অর্থাৎ কে কী কাজ করে তার আলোকে সমাজে যে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয় তা-ই সামাজিক স্তরবিন্যাস। তাঁদের মতে, স্তরবিন্যাস সর্বজনীন ও চিরন্তন। কেননা এটি সকল সমাজের সদস্যদেরকে নানা পদমর্যাদায় বিভক্ত করে যা ওই সমাজের শ্রমবিভাজন তৈরি করে (Stratification is universal because every society must distribute its members in the different positions that make up its division of labour.)

P. Sorokin বলেছেন, নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীর উঁচু-নিচু অবস্থানের ভিত্তিতে শ্রেণিসমূহের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তাকে সামাজিক স্তররবিন্যাস বলে। এটি স্পষ্টত সামাজিক স্তরের বিদ্যমান উঁচু-নিচু অবস্থানকে নির্দেশ করে (Social stratification means the differentiation of a given population into a hierarchically superposed classes. It is manifested in the existence of upper and lower social layers.) সরোকিন আরও মনে করেন, এটি মূলত চাপিয়ে দেওয়া একটি বিষয় যা সমাজস্থ মানুষকে উঁচু ও নিচু দলে বিভক্ত করে। এটি মানুষের অধিকার, পদমর্যাদা, কর্তব্য এবং দায়িত্বের অসম বন্টন।

সুতরাং সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে বিভিন্ন উপাদান এবং সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার ভিত্তিতে সমাজের সদস্যদের মধ্যে গড়ে ওঠা উঁচু-নিচু ভেদাভেদ, মর্যাদা ও শ্রমবিভাজনের পার্থক্য। সামাজিক স্তরবিন্যাসের ভিত্তিতেই সমাজে দাস-দাসমালিক, সামন্ত প্রভু-ভূমিদাস, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত, শাসক-শাসিত, মালিক–শ্রমিক, ধনী–দরিদ্র ইত্যাদি পার্থক্যমূলক শ্রেণি বা গোষ্ঠী দেখা যায়।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন (Types of social stratification)

ইতিহাস, ঐতিহ্য ও তত্ত্বগতভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাসের চারটি ধরন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

১। **দাস ব্যবস্থা** (Slavery): সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রথম ধরন হচ্ছে দাস ব্যবস্থা। কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার শুরুতে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার পর দাসভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এখানে দাস এবং দাস মালিকের মধ্যে উচ্চমাত্রার সামাজিক স্তরবিন্যাস পরিলক্ষিত হতো। দাসপ্রথায় একজন স্বাধীন মানুষ ((দাস মালিক) অপর একজন মানুষকে (দাস) জীবন্ত সম্পত্তি বলে গণ্য করতো।

২। **এস্টেট** (Estate): মধ্যযুগে বিশেষ করে ইউরোপের সামাজিক স্তরবিন্যাসের ভিত্তি ছিল এস্টেট। Estate শব্দের অর্থ হচ্ছে জমিদারের মালিকানাধীন জমি। অষ্টাদশ শতকে এস্টেট দ্বারা বিশেষ বিশেষ শ্রেণিকে বুঝানো হত। এস্টেট ব্যবস্থায় কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্র থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি (Manor) পেত। প্রাপ্ত ভূমিকে কেন্দ্র করে ভূমি মালিকের (সামন্ত প্রভু) ইচ্ছায় সমাজ পরিচালিত হত। সাধারণ শ্রেণি তার অনুগত থাকতে বাধ্য থাকত। এস্টেট ব্যবস্থায় তিনটি শ্রেণিকে ঘিরে সমাজব্যবস্থা এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস পরিচালিত ছিল। এগুলো হচ্ছে:

ক) যাজক শ্রেণি (The clergy— First estate),

খ) অভিজাত শ্রেণি (The nobility— Second estate) এবং

গ) সাধারণ শ্রেণি (The commons— Third estate)।

উল্লিখিত তিনটি এস্টেট সম্পর্কে Bottomore তাঁর *Sociology* গ্রন্থে বলেছেন, যাজক শ্রেণি সবার জন্য প্রার্থনা করতো, অভিজাত শ্রেণি সবার ভাগ্য নির্ধারণ ও নিরাপত্তা বিধান করতো এবং সাধারণ শ্রেণি সবার জন্য খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতো। এস্টেট প্রথা মূলত সামন্ত ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। এখানে সামন্ত প্রভু এবং ভূমিদাস ছাড়াও সামাজিক স্তরবিন্যাসে বেশকিছু মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল।

৩। **বর্ণপ্রথা** (Caste system): বর্ণপ্রথা হচ্ছে ভারতীয় সমাজের সনাতন (হিন্দু) ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক স্তরবিন্যাস। ভারতীয় হিন্দু সমাজে বংশগতভাবে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণি- যাদের পেশা, রীতিনীতি, সুযোগ-সুবিধা, কর্তব্য ও মূল্যবোধ ও ধর্মীয় রীতিনীতি স্বতন্ত্র বলে বিবেচিত তা-ই জাতিবর্ণ প্রথা হিসেবে বিবেচিত। Risley বলেছেন, বর্ণব্যবস্থা হচ্ছে কতগুলো পরিবারের সমষ্টি, যাদের একটা অভিন্ন পদবী আছে এবং যারা একটা অভিন্ন বংশধারার সাথে পরিচিত। তিনি বর্ণপ্রথার তিনটি পূর্বশর্তের (বৈশিষ্ট্য) উল্লেখ করেছেন। যথা: ক) একই পূর্বপুরুষের

পেশা থেকে আগত, খ) বাইরের সম্প্রদায়ের সাথে কোনো সম্পর্ক গড়ে তোলে না এবং গ) পূর্বপুরুষের পেশায় নিয়োজিত থাকে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রে চারটি বর্ণ এবং তাদের নিজ নিজ কর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে:

ক) ব্রাহ্মণ : প্রধানত ধর্মকর্ম এবং বিদ্যাচর্চায় নিয়োজিত;
খ) ক্ষত্রীয় : যোদ্ধা শ্রেণি হিসেবে পরিচিত;
গ) বৈশ্য : ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত এবং
ঘ) শূদ্র : শ্রমজীবী ও উৎপাদক শ্রেণি। অস্পৃশ্য এ শ্রেণির কোনো সামাজিক মর্যাদা নেই।

৪। **সামাজিক শ্রেণি** (Social class)**:** আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের স্তরবিন্যাসে শ্রেণি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণি হচ্ছে কিছু মানুষের সমষ্টি, যারা উৎপাদন ব্যবস্থায় অভিন্ন কার্য সম্পাদন করে। শ্রেণি সম্পর্কে Lenin বলেছেন, "classes are groups of people one of which can oppress the labour of the other." অর্থাৎ শ্রেণি হচ্ছে পরস্পর স্বার্থবিরোধী দু'টি গোষ্ঠী। শ্রেণি ব্যবস্থায় এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে শোষণ করে। Bottomore এর মতে, সামাজিক শ্রেণিগুলো হচ্ছে কার্যত বিভিন্ন দল। এ দলগুলো তুলনামূলকভাবে উন্মুক্ত, বদ্ধ নয়। নি:সন্দেহে তাদের ভিত্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক কিন্তু তারা অর্থনৈতিক দলের থেকেও বেশি কিছু। V.S. D. Souza শ্রেণি সম্পর্কে মার্কসের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ক) শ্রেণি হচ্ছে কিছু ব্যক্তির সমষ্টি যারা একই অর্থনৈতিক পরিবেশে অবস্থান করে। এ অর্থনৈতিক অবস্থানটা নির্ধারণ করে উৎপাদনের মালিকানার ভিত্তিতে। খ) শ্রেণি হচ্ছে একটি সহযোগী বা যৌথ দল (Corporate group)। এ দলটির বৈশিষ্ট্যগুলো একটা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যতুল্য। বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞানীরা শ্রেণিকে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা:

ক) উচ্চবিত্ত শ্রেণি (Upper class),
খ) মধ্যবিত্ত শ্রেণি (Middle class) এবং
গ) নিম্নবিত্ত শ্রেণি (Lower class)।

Gisbert মধ্যবিত্ত শ্রেণির তিনটি উপ-বিভাগের উল্লেখ করেছেন। যথা: উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণি, মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি। উল্লেখিত এসব শ্রেণি ছাড়াও শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজের স্তরবিন্যাসে আরো নানা ধরনের শ্রেণি পরিলক্ষিত হয়। যেমন: মালিক শ্রেণি–শ্রমিক শ্রেণি, বুর্জোয়া শ্রেণি–প্রলেতারিয়েত শ্রেণি, পুঁজিপতি শ্রেণি– পুঁজিবিহীন সর্বহারা শ্রেণি, উচ্চশিক্ষিত শ্রেণি–নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত শ্রেণি, পেশাজীবী (White color service holder) শ্রেণি–শ্রমজীবী (Hard worker/Labor) শ্রেণি, ক্ষমতাবান শাসক শ্রেণি–ক্ষমতাহীন শাসিত শ্রেণি ইত্যাদি।

বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস (Social stratification of Bangladesh)

বিভিন্ন সমাজে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অসমতাকে বিবেচনায় নিয়ে সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপর্যুক্ত ধরনগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা রয়েছে। তবে গ্রামীণ ও নগর সমাজের স্তরবিন্যাসে পৃথক উপাদান ক্রিয়াশীল। গ্রামীণ সমাজে কৃষি ভূমির মালিকানা, বংশগৌরব অত্যন্ত প্রভাবশালী উপাদান। আবার নগর সমাজে শিক্ষা, উচ্চতর পদবী, শিল্প-কল-কারখানা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সামাজিক স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে এখানে বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ক) ভূমি ও কৃষিভিত্তিক স্তরবিন্যাস: বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে ভূমি ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে কতগুলো শ্রেণি তৈরি হয়। এসব শ্রেণির মধ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যবধান এবং অসমতা রয়েছে। এর ভিত্তিতে তৈরি হয় গ্রামীণ সমাজের ভূমি ও কৃষিভিত্তিক স্তরবিন্যাস। যেমন: ১) ভূমিহীন দিনমজুর/কৃষিমজুর, ২) প্রান্তিক চাষী, ৩) ক্ষুদ্র চাষী, ৪) মাঝারি কৃষক, ৫) ধনী কৃষক এবং ৬) অনুপস্থিত ভূমি মালিক।

খ) বংশগত বা বর্ণভিত্তিক স্তরবিন্যাস: গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে বংশগত বা বর্ণভিত্তিক স্তরবিন্যাস একসময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে বর্তমানে এর প্রভাব অনেক কম। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বংশ বা জ্ঞাতিগোষ্ঠী বিশেষ প্রভাব ও মর্যাদার অধিকারী। তারা অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। যেমন– কোনো একটি অঞ্চলে 'সৈয়দ' বা 'চৌধুরী'

বংশ নিজেদেরকে শ্রেয়তর বিবেচনা করতে পারে। আবার অন্য একটি অঞ্চলে 'খান' কিংবা 'শেখ' বংশের আধিপত্য দেখা যায়। হিন্দু ধর্মে চতুর্বর্ণ প্রথা তাদের পেশা ও মর্যাদা নির্ধারণ করে দেয়।

গ) **পেশাভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাস:** বর্তমানে সমাজে কৃষিবহির্ভূত পেশার কদর বেশি। এ ধরনের পেশাজীবীদের মধ্যে ক্ষমতা, মর্যাদা এবং শ্রেণিগত ভেদাভেদ রয়েছে। যেমন– উচ্চপদস্থ (ক্ষমতাশালী) সরকারি কর্মকর্তা এবং তাদের অধীনস্ত সাধারণ সরকারি কর্মচারী; বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বনাম সাধারণ কর্মচারী; শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবস্থাপক বনাম শ্রমিক শ্রেণি।

ঘ) **শিক্ষার ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস:** শিক্ষার ভিত্তিতে সমাজে নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত, শিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিত শ্রেণির মানুষ পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার ফলে তাদের পেশা এবং সামাজিক মর্যাদাও ভিন্ন হয়ে থাকে।

ঙ) **আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস:** অর্থবিত্ত, সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে সমাজে উচ্চবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং বিত্তহীন শ্রেণির উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। সামাজিক সম্মান, মর্যাদা ও ক্ষমতার ভিত্তিতে এ শ্রেণিগুলোর মধ্যে দৃশ্যমান পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

চ) **ধর্মভিত্তিক স্তরবিন্যাস:** বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। পাশাপাশি এখানে হিন্দু, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মের মানুষও বসবাস করে। ধর্মীয় পরিচয় মানুষের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। মুসলমান-হিন্দু, আশরাফ-আতরাফ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ইত্যাদি বিভাজন তৈরি হয় ধর্মের ভিত্তিতে। এছাড়া ধর্মগুরু, ধর্মীয় নেতা, ইমাম, আলেম, পির, সাধু-সন্ন্যাসি প্রমুখ সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। সাধারণ মানুষের সাথে এদের মর্যাদাগত পার্থক্য (স্তরবিন্যাস) বিদ্যমান।

ছ) **ক্ষমতা, রাজনীতি ও সম্পদভিত্তিক স্তরবিন্যাস:** ক্ষমতা, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, এবং ধন-সম্পদ সামাজিক স্তরবিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যিনি অনেক অর্থ-বিত্তের মালিক তিনি অন্যের উপর কর্তৃত্ব খাটাতে পারেন। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা, জনপ্রতিনিধি এবং তাদের নিকটাত্মীয়রা বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদার দাবিদার। সাধারণ মানুষের উপর তাঁরা প্রভাব বিস্তার করেন।

জ) **বাসস্থান ও বসবাসের এলাকার ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস:** বাসস্থান ও বসবাসের এলাকার ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক স্তরবিন্যাস মূলত নগর সমাজে পরিলক্ষিত হয়। বসবাসের ভিত্তিতে এখানে বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটিয়া– দুই শ্রেণির মানুষ রয়েছেন। চাকরির সুবাদে অনেকে সরকারি বাসায় থাকেন। এরাও একটি বিশেষ শ্রেণি। শহরে কিছু অভিজাত এলাকা রয়েছে। যেমন ঢাকা শহরের গুলশান, বারিধারা, বনানী, ধানমণ্ডি এলাকায় নিজস্ব ভবন, ফ্ল্যাট বা সরকারি বাসায় বসবাসকারী মানুষ উচ্চবিত্ত শ্রেণির। আবার এসব অঞ্চলে যারা ভাড়া থাকেন তাদেরকে মধ্যবিত্ত বলে বিবেচনা করা যায়। অন্যদিকে শহরে অবস্থান করেও অনেকে বস্তিতে বসবাস করেন। ছিন্নমূল অনেকে বস্তিতেও ঠাঁই না পেয়ে ফুটপাথ, বাসস্টেশন, রেলস্টেশন প্রভৃতি স্থানে (ভাসমান) রাত্রি যাপন করে। বাসস্থানের ভিত্তিতে এরা শহরের নিম্নবর্গের মানুষ।

সারসংক্ষেপ

বংশ, বর্ণ, সম্পদে মালিকানার ধরন, ক্ষমতা ও মর্যাদার ভিত্তিতে সমাজে মানুষের মধ্যে যে অসমতা ও উঁচু-নিচু পার্থক্য তৈরি হয় তাই সামাজিক স্তরবিন্যাস। দাসপ্রথা, এস্টেট ব্যবস্থা, বর্ণপ্রথা এবং সামাজিক শ্রেণি সমাজের চিরায়ত স্তরবিন্যাসের শক্তিশালী ধরন। আধুনিক সমাজে বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে যে শ্রেণি বিভাজন হয় তা সামাজিক স্তরবিন্যাসের নামান্তর। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর সমাজেও নানা উপাদানের ভিত্তিতে অনুরূপ সামাজিক স্তরবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়।

পাঠ-৯.৪ বাংলাদেশের শ্রেণি কাঠামো
Class Structure of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রেণি কাঠামো বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- শ্রেণি কাঠামোর উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

শ্রেণি কাঠামো কী
What is class structure

শ্রেণি কাঠামোর আলোচনা থেকে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের শ্রেণি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এখানে শ্রেণি গঠনের মূলে কোন কোন উপাদানের ভূমিকা রয়েছে তারও প্রতিফলন ঘটে। বাংলাদেশের শ্রেণি কাঠামো হচ্ছে দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে বিদ্যমান শ্রেণিসমূহের অধ্যয়ন। বাংলাদেশের শ্রেণি কাঠামো অধ্যয়নে গ্রামীণ ও নগর সমাজ তথা কৃষি ও শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের শ্রেণির উপস্থিতি রয়েছে। শ্রেণির পাশাপাশি শ্রেণি বিভাজনের উপাদানগুলোও এখানে গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়।

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থাকে মোটা দাগে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়– গ্রামীণ সমাজ এবং নগর সমাজ। তবে গ্রামীণ জীবন ও জীবিকা, সমাজ, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিই বাংলাদেশের মূল পরিচয়। এখনো দেশের প্রায় ৬৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন। জীবীকার প্রয়োজনে যারা শহরে বসবাস করেন তাদের অধিকাংশের শিকড় গ্রামে প্রোথিত। তবে ক্রমবিকাশমান নগর সমাজের বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ-সুবিধার আকর্ষণে গ্রাম থেকে মানুষের শহরে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রেও নগর সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পায়ন, নগরায়ণ, আধুনিকতা এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষ মানুষকে নগর সমাজের প্রতি আকৃষ্ট করছে। সুতরাং বর্তমান বাংলাদেশকে বুঝতে হলে গ্রামীণ এবং নগর উভয় সমাজের সামগ্রিক অধ্যয়ন জরুরি। বাংলাদেশের শ্রেণি কাঠামোর আলোচনায়ও গ্রামীণ এবং নগর সমাজকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন উপাদান ও শ্রেণি কাঠামো (Different factors and social structure): বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে এখানে বাংলাদেশের শ্রেণি কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

(ক) সম্পদের ভিত্তিতে শ্রেণি কাঠামো: সম্পদ হচ্ছে অর্থনৈতিক উপযোগ সম্বলিত কোন বিষয় বা বস্তু (Things)। এর দ্বারা মানুষের অভাব, প্রয়োজন বা চাহিদা নিবৃত্ত করা যায়। গ্রামীণ সম্পদের মধ্যে ভূমি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভূমি ছাড়াও নগদ অর্থ, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, আধুনিক যন্ত্রপাতি গ্রামীণ সম্পদের উল্লেখযোগ্য উপাদান। সম্পদের ভিত্তিতে গ্রামীণ শ্রেণিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা:

(i) সম্পদশালী শ্রেণি: জমি-জমা, বাড়ি-গাড়ি-ফ্ল্যাট, নগদ অর্থ, দামি অলঙ্কার, আসবাবপত্র প্রভৃতির মালিক সম্পদশালী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদায় এরাই শীর্ষস্থানীয়। সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ সমাজের এলিট শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত। এরাই মূলত গ্রামীণ সমাজের সম্পদশালী শ্রেণি (Have class)।

(ii) সম্পদহীন শ্রেণি: যাদের কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ নেই সমাজে তারাই সম্পদহীন শ্রেণি। জমি-জমার মালিকানা, মানসম্পন্ন বসতবাড়ি, মৌলিক চাহিদা পূরণের মত নগদ অর্থ কোনটিই এদের অধিকারে নেই। গ্রামীণ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই সম্পদহীন কিংবা খুব কম পরিমাণ সম্পদের মালিক। এদের সামাজিক অবস্থানও খুব উঁচুতে নয়। মার্ক্সীয় দর্শনে এদেরকে সম্পদহীন বা অ-মালিক শ্রেণি (Have not class) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) **ভূমির মালিকানার ভিত্তিতে শ্রেণি কাঠামো:** গ্রাম কিংবা শহর সর্বত্রই ভূমি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান, যার ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণি বিভাজন করা যায়। সমাজে নিজের অবস্থান এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে ভূমির মালিকানা একটি বড় শক্তি। ভূমির ভিত্তিতে সমাজের মানুষকে দু'টি শ্রেণিকে বিভক্ত করা যায়। যথা:

(i) ভূ-মালিক শ্রেণি এবং (ii) ভূমিহীন শ্রেণি।

(i) ভূ-মালিক শ্রেণি: সাধারণত বসতবাড়ি ব্যতীত চাষাবাদ কিংবা উৎপাদনমূলক কাজের জন্য কমপক্ষে ০.৫ একর জমির মালিকানা থাকলে তাকে ভূ-মালিক বলে। ভূমির মালিকদের সমষ্টি হচ্ছে ভূ-মালিক শ্রেণি। ভূ-মালিক শ্রেণিকে আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন:

১। **ক্ষুদে খামার মালিক শ্রেণি:** যাদের ০.৫ একর থেকে ২.৪৯ একর পর্যন্ত ভূমি আছে তারা ক্ষুদে খামার মালিক শ্রেণির অন্তর্গত। বাংলাদেশের ভূমি মালিকদের একটি বড় অংশই এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। শ্রেণি কাঠামোতে এদের অবস্থান ভূমিহীনদের পরে।

২। **মাঝারি খামার মালিক শ্রেণি:** ২.৫ একর থেকে ৭.৪৯ একর পর্যন্ত যাদের জমি আছে তারা মাঝারি খামার মালিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। সমাজব্যবস্থায় এরা হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবেও পরিচিত।

৩। **বড় খামার মালিক শ্রেণি:** ৭.৫ একরের বেশি জমির অধিকারীদেরকে বড় খামার মালিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমাজে এদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। কৃষি ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকুরি প্রভৃতি উৎস থেকে এদের উপার্জন হয়। সমাজব্যবস্থায় এরা প্রায়শ উচ্চবিত্ত হিসেবে পরিচিত।

(ii) ভূমিহীন শ্রেণি: সাধারণত যাদের কোনো ভূমি নেই তারাই ভূমিহীন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তবে সর্বোচ্চ ০.৫ একর পর্যন্ত ভূমি থাকলেও তাকে ভূমিহীন বলে মনে করা হয়। ভূমিহীনদের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে ভূমিহীন শ্রেণি। বর্তমানে বাংলাদেশের ৪০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ভূমিহীন। ভূমিহীন শ্রেণিকে আবার তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা:

ভূমিহীন-১: ভূমিহীন–১ হচ্ছে গ্রামের সেসব দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের কোনো জমি-জমা বা ভূমি নেই। এ শ্রেণির ভূমিহীনদের বসবাসের জন্যও কোনো জমি নেই। ২০০৮ সালের কৃষি শুমারি অনুযায়ী দেশের ১৫.৬২ শতাংশ পরিবার সম্পূর্ণ ভূমিহীন।

ভূমিহীন-২: এ শ্রেণির ভূমিহীনদের বসতবাড়ির জন্য সামান্য ভূমি আছে, কিন্তু চাষাবাদ বা উৎপাদনের জন্য কোনো ভূমি নেই।

ভূমিহীন-৩: ভূমিহীন-৩ হচ্ছে সেসব মানুষ যাদের বসতভিটা ব্যতীত সর্বোচ্চ ০.৫ একর আবাদী বা উৎপাদনমূলক জমি রয়েছে। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় ব্যাপকসংখ্যক মানুষ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

(গ) **চাষাবাদের ভিত্তিতে শ্রেণি কাঠামো:** চাষাবাদের ভিত্তিতে গঠিত শ্রেণি কাঠামো প্রধানত গ্রামীণ সমাজের জন্য প্রযোজ্য। যারা প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকাজ বা চাষাবাদের সাথে যুক্ত তাদের মধ্যে প্রধানত দু'টি শ্রেণি পরিলক্ষিত হয়। যথা:

১। **মালিক চাষী:** যে কৃষক বা চাষী তার নিজ ভূমিতে চাষাবাদ করে ফসল ফলান তিনি মালিক চাষী। গ্রামে অবস্থানকারী প্রায় সব জমির মালিকরাই চাষী। মালিক চাষীরা আবার তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা: (i) ক্ষুদে মালিক চাষী, (ii) মাঝারি মালিক চাষী এবং (iii) বড় মালিক চাষী।

২। **বর্গাচাষী:** ভূমিহীন বা প্রান্তিক কৃষকই মূলত বর্গাচাষী। নিজের সামান্য জমিতে উৎপাদিত ফসল দ্বারা যখন পরিবারের মৌলিক প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় না, তখন ভূমিহীন বা প্রান্তিক কৃষক বৃহৎ খামার মালিক কিংবা অ-কৃষক ভূমি মালিকের জমি বর্গা চাষ করেন। একজন কৃষকের মোট আবাদকৃত জমির ২৫ শতাংশ বর্গা প্রথায় গৃহীত হলে তাকে বর্গাচাষী বলে অভিহিত করা হয়।

(ঘ) **কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমের ভিত্তিতে শ্রেণি কাঠামো:** গ্রামীণ শ্রেণি কাঠামোতে কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমের ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ। এদেরকে ছাড়া কৃষি উৎপাদন প্রায় অসম্ভব। এ শ্রেণির সদস্যরা ভূমি মালিক, কৃষক বা বর্গাচাষী নয়; তারা কৃষি শ্রমিক বা ক্ষেতমজুর। এদেরও তিনটি পৃথক শ্রেণি রয়েছে। যথা:

(i) **স্থায়ী মজুর:** কৃষি শ্রমিক বা ক্ষেতমজুরদের এ শ্রেণিটি মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে কমপক্ষে একবছর (এটি ৫/১০ বছরও হতে পারে) নির্দিষ্ট ভূমি-মালিকের মজুর হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে এ ধরনের মজুর দেখা যায় না বললেই চলে।

(ii) **পারিবারিক মজুর:** পারিবারিক মজুরও অনেকটা স্থায়ী মজুরের মত। এরা কৃষক পরিবারের কৃষি ছাড়াও অন্যান্য কাজও করে দেয়। এরা অনেকটা পরিবারের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হয়। স্থায়ী বা পারিবারিক মজুরদের অনেকে ষাণ্মাসিক কিংবা বার্ষিক চুক্তিতেও কাজ করে থাকে।

(iii) **দিনমজুর:** দিনমজুরদের কোন স্থায়িত্ব বা সুনির্দিষ্টতা নেই। তারা দৈনিক শ্রম দেয় এবং নির্দিষ্ট হারে মজুরি পায়। দিন মজুররা স্থানীয় হতে পারে, আবার এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গিয়েও দিনমজুরি করতে পারে।

(ঙ) **শিল্পোৎপাদনে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে শ্রেণি কাঠামো:** শিল্পোৎপাদনে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে নগর সমাজে স্বতন্ত্র শ্রেণি কাঠামো গড়ে ওঠে। এখানে যেসব শ্রেণি পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে:

(i) **মালিক শ্রেণি:** শিল্প-কল-কারখানার যারা মালিক, যাদের পুঁজি বিনিয়োগের ফলে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তারা মালিক শ্রেণির অন্তর্গত। এদেরকে পুঁজিপতি, শিল্পপতি, বুর্জোয়া বলেও অভিহিত করা হয়।

(ii) **ব্যবস্থাপক শ্রেণি:** বিভিন্ন শিল্প-কল-কারখানা তারা মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিক এবং কৌশলগত কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বেতনভুক্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যবস্থাপক শ্রেণি হিসেবে পরিগণিত। মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যবর্তী অবস্থানে হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা মালিক পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণ করেন।

(iii) **শ্রমিক শ্রেণি:** শিল্পোৎপাদনের সবথেকে বড় শক্তি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণি। এদের শ্রমেই উৎপাদন সচল থাকে। নগর সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শিল্প-কল-কারখানার শ্রমিক।

(চ) **পেশাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে শ্রেণি কাঠামো:** ইতোমধ্যে গ্রামীণ সমাজের কৃষি উৎপাদনে এবং নগর সমাজের শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থায় সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে বেশকিছু শ্রেণির উল্লেখ করা হয়েছে। উৎপাদনের উল্লেখিত ক্ষেত্র দু'টি ছাড়াও সেবাখাত, ব্যবসা-বাণিজ্য, আত্মকর্মসংস্থানসহ নানা ক্ষেত্রে অসংখ্য মানুষ কর্মরত রয়েছেন। বাংলাদেশের শ্রেণি কাঠামোতে তারাও গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত। যেমন:

(i) **পেশাজীবী শ্রেণি:** কায়িক পরিশ্রমের পরিবর্তে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমে নিয়োজিত (White colour job) ব্যক্তিবর্গ পেশাজীবী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, সামরিক-বেসামরিক আমলা, আইনজীবী, সাংবাদিক, ব্যাংকার প্রমুখ পেশাজীবী শ্রেণিভুক্ত।

(ii) **ব্যবসায়ী শ্রেণি:** বাংলাদেশের শ্রেণি কাঠামোয় ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম কিংবা শহর সর্বত্রই ব্যবসায়ী শ্রেণির উপস্থিতি রয়েছে। এ শ্রেণিতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মাঝারি ব্যবসায়ী এবং বড় ব্যবসায়ীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

(iii) **শ্রমজীবী শ্রেণি:** কৃষি কিংবা শিল্পোৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিক ছাড়াও সমাজে নানা ধরনের শ্রমজীবী মানুষ রয়েছে। এরা মূলত কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন। বিভিন্ন অফিসের অফিস সহায়ক কর্মচারী, সাধারণ সৈনিক বা কনস্টেবল, নির্মাণ শ্রমিক, পরিবহণ শ্রমিক, রিক্সা-ভ্যান চালক, হকার, সাধারণ দিনমজুর শ্রমজীবী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

(iv) **ভিক্ষুক-ভবঘুরে:** গ্রাম এবং শহর সর্বত্রই ভিক্ষুক, ভবঘুরে এবং ছিন্নমূল মানুষের একটি গোষ্ঠী রয়েছে। এরা মূলত অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের শ্রেণি কাঠামোতে উপর্যুক্ত শ্রেণিসমূহ ছাড়া আরো নানা ধরনের শ্রেণির উপস্থিতি রয়েছে। শ্রেণি কাঠামোতে ছাত্র-ছাত্রী, বেকার, গৃহিনী শ্রেণিকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। পাশাপাশি গ্রামীণ শ্রেণি কাঠামোতে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী পেশার উপস্থিতি রয়েছে। যেমন- জেলে, কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, মুচি, বেহারা (পালকি-বাহক) প্রভৃতি।

সারসংক্ষেপ

শ্রেণি কাঠামো হচ্ছে সমাজের মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভাজনের একটি রূপরেখা। বিভাজনের মূলে রয়েছে নানা ধরনের উপাদান। অর্থনৈতিক, পেশাগত, বংশগত, ক্ষমতা ও মর্যাদার যেসব উপাদান মানুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে তার মাধ্যমেই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি পরিলক্ষিত হয়। গ্রামীণ ও নগর সমাজের বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের শ্রেণি কাঠামো গড়ে উঠেছে।

পাঠ-৯.৫ বাংলাদেশের ক্ষমতা কাঠামো
Power Structure of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্ষমতা কাঠামো এবং এর কাঠামোর উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- গ্রামীণ এবং নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- গ্রামীণ ও নগর সমাজের ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করতে পারবেন।

ক্ষমতা কাঠামো কী
What is power structure

ক্ষমতা হচ্ছে এক প্রকার শক্তি যার মাধ্যমে অন্যের সিদ্ধান্ত, ইচ্ছা, মতামত, এমনকি আচার-আচরণকে প্রভাবিত করা যায়। অন্যের উপর নিজের সিদ্ধান্ত, ইচ্ছা বা মতামতকে চাপিয়ে দেওয়ার সামর্থ্যই ক্ষমতা। আর ক্ষমতা কাঠামো হচ্ছে ক্ষমতা প্রয়োগের প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়া বা কাঠামোর মধ্য দিয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় তাকে ক্ষমতা কাঠামো (Power structure) বলে। আমরা জানি, বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা গ্রামীণ ও নগর দু'টি স্বতন্ত্র ধারা ও উপাদানে পরিচালিত। উভয় সমাজব্যবস্থারই রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। গ্রামীণ ও নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর ক্ষেত্রেও আলাদা আলাদা উপাদান ক্রিয়াশীল।

গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতা কাঠামো (Power structure of rural society)

গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতা প্রয়োগের যে কাঠামো এবং ব্যবস্থা বিদ্যমান তাকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো বলে। ড. আতিউর রহমান তাঁর '*বাংলাদেশে উন্নয়নের সংগ্রাম*' গ্রন্থে ক্ষমতা কাঠামো সম্পর্কে বলেছেন, "শ্রেণিসমূহের অবস্থান, পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এদের ভূমিকা ইত্যাদি প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ সমাজে সামাজিক শক্তিসমূহ যে কাঠামোর মধ্য দিয়ে বিকশিত হয় তাকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো বলা যেতে পারে।" গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় কাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব রয়েছে, কিভাবে এ কর্তৃত্ব বিকশিত হয়– এসবের ভিত্তিতে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো তৈরি হয়। ক্ষমতার যেসব উপাদান কর্তৃত্ব নির্ধারণে ভূমিকা রাখে সেসব উপাদানের সমন্বয়ে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর বিকাশ ঘটে। গ্রামীণ ক্ষমতার ব্যবহার, প্রয়োগ এবং বিকাশ হয় মূলত গ্রামীণ শ্রেণি কাঠামোর মাধ্যমে। এক্ষেত্রে এলিট শ্রেণি ক্ষমতার চর্চা করেন এবং সাধারণ মানুষের উপর ক্ষমতার প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ ক্ষমতা কাঠামো বিন্যাসে এক শ্রেণি নিয়ন্ত্রক বা শাসকের ভূমিকা পালন করেন, অন্য শ্রেণি নিয়ন্ত্রিত বা শাসিত হয়। গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতার চর্চা ও প্রয়োগকে কেন্দ্র করেই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো গড়ে ওঠে।

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর উপাদান: সাধারণত গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় যেসব শক্তি বা উপকরণ ব্যক্তিবিশেষকে ক্ষমতার অধিকারী করে তোলে সেগুলোকে গ্রামীণ ক্ষমতার উপাদান বলে। গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে ভূমি হচ্ছে ক্ষমতা কাঠামোর মূল ভিত্তি। ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানা ছাড়াও সনাতন উপাদান হিসেবে বংশমর্যাদা ও জ্ঞাতিসম্পর্ক, হিন্দুসমাজে বর্ণপ্রথা, জনপ্রতিনিধিত্ব, ধর্মীয় নেতৃত্ব, স্থানীয় নেতৃত্ব (মোড়ল-মাতব্বর) প্রভৃতি ব্যক্তির ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। কৃষি আধুনিকীকরণের ফলে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় সেচযন্ত্রের মালিকানা এবং সার-বীজ-কীটনাশকের ডিলারশিপের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শহরের সাথে যোগাযোগ, ভূমি জরিপের সাথে সংশ্লিষ্টতা, পেশীশক্তি, চর বা জমি দখলের ক্ষমতা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সনাতন উপাদান হিসেবে বিবেচিত। শিক্ষক, মাওলানা-মৌলবি, ইমাম-মুয়াজ্জিন, পির-মাশায়েখ, পুরোহিত-ব্রাহ্মণ, ওঝা-ফকির এমনকি দালাল, টাউট-বাটপাড়, সুদখোর মহাজন, মজুতদার গ্রামের সাধারণ মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপে সক্ষম। ফলে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় তাদের প্রভাব অনস্বীকার্য।

গত শতাব্দীর আশির দশকে উপজেলা প্রশাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় নতুন নতুন উপাদান যুক্ত

হয়েছে। সমবায় সমিতি, ব্যাংক, থানা-পুলিশ ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক; চাকরি, স্থানীয় সরকার কিংবা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা; কৃষিবহির্ভূত আয়, নগদঅর্থ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ও তার পরিবার, আইনজীবী, পেশাজীবী, আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তিবর্গ, ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী, এনজিও কর্মী, মোড়ল-মাতব্বর, ফতোয়াবাজ প্রমুখ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিল্প ও সেবাখাতের বিকাশ, অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রভৃতি গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় নতুন নতুন উপাদান যুক্ত করেছে। যেমন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সংযোগ, টিভি, ফ্রিজ, এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোনসহ ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী, মোটর সাইকেল প্রভৃতির মালিকানা, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, নগদটাকার প্রবাহ ও মালিকানা, উচ্চশিক্ষা, চাকরির সুযোগ-সুবিধা ও প্রভাব বর্তমান গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে গ্রামীণ সমাজে মুক্তিযোদ্ধাদেরও বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ড. আতিউর রহমান তাঁর *'বাংলাদেশে উন্নয়নের সংগ্রাম'* শীর্ষক গ্রন্থে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর স্বাধীন ও নির্ভরশীল চলকের ভিত্তিতে মোট **১৯**টি উপাদানের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে: **১**। ভূমির মালিকানা, ২। অর্থনৈতিক শক্তি, **৩**। সমাজে নেতৃত্ব, ৪। বংশমর্যাদা ও নেতৃত্ব, ৫। বৃহৎ জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্ব, ৬। ব্যক্তিগত গুণাবলি, ৭। রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক, ৮। রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক, ৯। ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিত্ব, **১০**। শহরের সাথে যোগাযোগ, **১১**। সমবায় সমিতি বা এনজিও'র নেতৃত্ব, **১২**। গ্রামীণ কর্মসংস্থানগুলোর নেতৃত্ব, **১৩**। জনগণের অংশ বিশেষের নেতৃত্ব, **১৪**। আধুনিক প্রযুক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ, **১৫**। অর্থ ঋণ প্রদান, **১৬**। চাকরি, **১৭**। শিক্ষা, **১৮**। সন্ত্রাস সৃষ্টির ক্ষমতা এবং **১৯**। জনগণের ঐক্যবদ্ধ ক্ষমতা। বলা যেতে পারে, এ উপাদানগুলোই গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর মূল ভিত্তি। তবে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসব উপাদানও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে।

নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামো (Power structure of urban society)

নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর সাথে সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন উপাদানের সাদৃশ্য রয়েছে। বস্তুত প্রতিটি সমাজেই এমনকিছু উপাদান থাকে যা ওই সমাজের স্তরবিন্যাস, শ্রেণি কাঠামো এবং ক্ষমতা কাঠামো নির্ধারণ করে। নিম্নে নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান তুলে ধরা হলো:

১। **পেশাভিত্তিক ক্ষমতা:** পেশাভিত্তিক ক্ষমতার শীর্ষে রয়েছেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, যারা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। প্রশাসন, পুলিশ ও বিচার বিভাগ এবং সশস্ত্র বাহিনীর উর্ধতন কর্মকর্তাগণ ক্ষমতা প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সরকারি সেবা সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাগণও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। পেশাগতভাবে সাংবাদিক এবং আইনজীবীদের প্রভাবও সমাজে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

২। **সম্পদে মালিকানার ভিত্তিতে ক্ষমতা:** শহরে বাড়ি, গাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মালিকানা মানুষকে ক্ষমতায়িত করে। এগুলোর মালিকানা একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক, তেমনি অন্যের উপর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব আরোপের উপায়।

৩। **রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও জনপ্রতিনিধিত্ব:** রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্ষমতা কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। জাতীয় এবং স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিগণ ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের অধিকারী। রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকগণও নিজ নিজ মহল্লায় অনেক প্রভাবশালী। ক্ষমতাসীন ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতা-কর্মী-সমর্থকগণও ক্ষমতা কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

৪। **শিক্ষার ভিত্তিতে ক্ষমতা:** অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ পেশাগত দিক থেকে ভালো অবস্থানে থাকেন। সম্মান এবং মর্যাদার দিক থেকেও তারা অগ্রগামী। সুতরাং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ প্রায়শ ক্ষমতাশালী হয়ে থাকেন।

৫। **গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজ:** নগর সমাজের ক্ষমতা চর্চা ও প্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজ। প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রোনিক গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজ জনমত গঠন এবং সরকারের নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফলে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার দিক থেকে যথেষ্ট প্রভাবশালী।

৬। **স্থায়ী বাসিন্দা:** শহরের বিভিন্ন মহল্লায় যারা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করেন তাঁরা অনেকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী। এদের অনেকের নিজ নিজ এলাকায় পর্যাপ্ত নিজস্ব ভূমি ও জ্ঞাতিগোষ্ঠী রয়েছে যা তাদেরকে বিশেষভাবে ক্ষমতায়িত করে।

৭। **অর্থ-সম্পদ:** অর্থ-বিত্তের ক্ষমতা সর্বজনীন। গ্রাম বা শহর যেকোনো স্থানে যিনি পর্যাপ্ত অর্থ-সম্পদের মালিক তিনি

ক্ষমতারও অধিকারী। 'টাকার জোরে' তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

৮। **ব্যবসায়িক নেতৃত্ব:** নগর সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বণিক সমিতি, ব্যবসায়িক সংগঠন, দোকান মালিক সমিতি যেকোনো স্তরের নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ পরিসরে যথেষ্ট প্রভাবশালী।

৯। **ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্টতা:** আত্মীয়তা কিংবা পেশাগতভাবে কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা সংগঠনের সাথে সম্পর্ক থাকলে অনেকে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারেন। কোনো মন্ত্রী-এমপি'র আত্মীয়, পুলিশ-র‍্যাবের সোর্স, পাসপোর্ট অফিসের দালাল, স্থানীয় ক্লাবের নেতা প্রমুখ নগর সমাজের ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারেন।

১০। **স্থানীয় মাস্তান:** মহল্লার ত্রাস সৃষ্টিকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী মাস্তানদের সবাই সমীহ করে। যারা মাস্তানি কিংবা চাঁদাবাজী করে তাদেরকে সবাই ভয় করে। সুতরাং অনৈতিক বা অবৈধ হলেও মাস্তান এবং চাঁদাবাজরা ক্ষমতা কাঠামোর অনিবার্য অংশীদার।

সারসংক্ষেপ

যে প্রক্রিয়ায় সমাজের কিছু মানুষ ক্ষমতা অর্জন ও চর্চা করে তাকে ক্ষমতা কাঠামো বলে। ক্ষমতা অর্জনের মূলে বিভিন্ন উপাদান ক্রিয়াশীল থাকে। যেমন কেউ অনেক ভূসম্পত্তি কিংবা অর্থবিত্তের মালিক, কেউ আবার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট, আবার কেউ হয়ত উচ্চশিক্ষিত এবং কর্তৃত্বপূর্ণ চাকরি করেন। এরা সবাই ক্ষমতার অধিকারী এবং এরা সমাজের সাধারণ মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম। নানা উপাদানের ভিত্তিতে সমাজে ক্ষমতা কাঠামো তৈরি হয়। গ্রামীণ এবং নগর সমাজে উপাদানের ভিন্নতার কারণে ক্ষমতা কাঠামোতে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

ইউনিট মূল্যায়ন

১। সামাজিক কাঠামো বলতে কী বুঝেন? সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
(What do you mean by social structure. Discuss the characteristics of Social structure.)

২। সামাজিক কাঠামোর সংজ্ঞা দিন। "সমাজের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান এবং দলই হচ্ছে সামাজিক কাঠামো"- ব্যাখ্যা করুন।
(Define social structure. "Social structure means the major institutions and groups"- Explain.)

৩। সামাজিক কাঠামো কী? বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক কাঠামো ব্যাখ্যা করুন।
(What is social structure? Explain the present social structure of Bangladesh.)

৪। বাংলাদেশের পরিবর্তিত সামাজিক কাঠামোর বিবরণ দিন।
(Discuss the changing social structure of Bangladesh.)

৫। সামাজিক অসমতা কাকে বলে? বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।
(What is called social inequality? Discuss about the social stratification of Bangladesh.)

৬। সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞা দিন। সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরনসমূহ বিশ্লেষণ করুন।
(Define social stratification. Analyze the types of social stratification.)

৭। শ্রেণি কাঠামো কাকে বলে?। বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের শ্রেণি কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করুন।
(What is called class structure? Discuss the class structure of Bangladesh based on different elements.)

৮। ক্ষমতা কাঠামো বলতে কী বুঝেন?। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামো ব্যাখ্যা করুন।
(What do you mean by power structure? Explain the rural and urban power structure of Bangladesh.)